গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৩০ জুলাই - ৫ আগস্ট ২০২১ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

নিজেদের মধ্যেকার অবিপ্লবী ভাবনাকে যদি নিজেরা ধরতে পারেন, সেইটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি

৫ আগস্ট, সর্বহারার মহান নেতা, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী দেশব্যাপী যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় পালন করার আহ্বান জানিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষাগুলি উপলব্ধি করে নিজ নিজ বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার দ্বারাই মহান নেতার প্রতি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি। এই লক্ষ্য থেকেই বিপ্লবী কর্মীদের আচার-আচরণ সংক্রান্ত তাঁর মূল্যবান কিছু শিক্ষা 'শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে' পুস্তিকা থেকে আমরা এখানে তুলে ধরলাম। — সম্পাদক, গণদাবী

"শুধু স্লোগান দিয়ে কোনও দেশে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবের জন্য মানুষের একটা সুস্থ এবং সুষ্ঠু নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে। মানুষগুলো যদি স্লোগানসর্বস্ব হয়, যদি দলবদ্ধ থাকলে সাহসী, দলবদ্ধ না থাকলে কুঁকড়ে

পাঁচের পাতায় দেখুন

ভাড়া নিয়ে নিরপেক্ষ কমিটি চাই

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

পেট্রল-ডিজেলের দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে সরকারি ও বেসরকারি বাস যথেচ্ছ ভাড়া নিয়ে চলেছে। একেক বাসে একেক রকম ভাড়া। যেন কে কত বেশি নিতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। যাত্রীরা ক্ষোভে ফুটছে। রাজ্য সরকার সব দেখেও নীরব। দরকার ছিল উপযুক্ত সংখ্যায় সরকারি বাস চালিয়ে সাধারণ মানুষের সুরাহার কোনও ব্যবস্থা করা। সরকার তাও করেনি।

এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে ২৩ জুলাই পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হয়, সুষ্ঠুভাবে বাস ও অন্যান্য পরিবহণের ভাড়া নির্ধারণের জন্য যাত্রী কমিটির প্রতিনিধি সহ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ কমিটি তৈরি করা হোক। সেই কমিটি সমস্ত দিক বিবেচনা করে দ্রুত ভাড়া নির্ধারণ করুক। একই সাথে ভাড়াবৃদ্ধির দুঃসহ চাপ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনে ভর্তুকি দিক।

কলকাতার নাগেরবাজারে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মিছিল

মন্ত্রীকে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়, করোনা অতিমারিতে সাধারণ মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ, অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই ও কলকারখানা বন্ধ থাকার কারণে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত পেট্রল-ডিজেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়েই চলেছে। প্রতি লিটার পেট্রলে ৩২ টাকা ৯০ পয়সা এবং প্রতি লিটার ডিজেলে ৩১ টাকা ৮০ পয়সা ট্যাক্স কেন্দ্রীয় সরকারই আদায় করছে। রাজ্য সরকারও এই অস্বাভাবিক বর্ধিত মূল্যের উপর লিটার প্রতি পেট্রোলে ১৮ টাকা ৪৬ পয়সা এবং ডিজেলে ১২ টাকা ৫৭ পয়সা ট্যাক্স চাপিয়ে তাদের কোষাগার ভর্তি করছে। ফলে বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম দাঁড়িয়েছে মূল দামের প্রায়

দুয়ের পাতায় দেখুন

স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা

উচ্চমাধ্যমিকে রেজাল্ট বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদ, সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারীদের ভ্যাকসিন দিয়ে ক্লাস-রুম পঠন-পাঠন চালু, ফি মকুব এবং পরিবহণে ছাত্র কনসেশনের দাবিতে ২৬ জুলাই রাজ্যের শতাধিক স্থানে পথ অবরোধ হয়। গ্রেপ্তার বহু। কলকাতায় (ছবি) ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাঁকুড়ায় ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে খুনের মামলা দেয়।

ডোমের চাকরির লাইনে ইঞ্জিনিয়াররাও

কর্মসংস্থান নিয়ে সরকারের বড়াই সার

এনআরএস মেডিকেল কলেজে ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্টের (ডোম) ৬টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ, বেতন মাসে ১৫ হাজার টাকা। মাত্র ২৭ দিনে ৮ হাজার আবেদন জমা পড়েছে—ইঞ্জিনিয়ার প্রায় ১০০, স্নাতকোত্তর প্রায় ৫০০, স্নাতক ২ হাজারের বেশি। দেখে চক্ষু চড়কগাছ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরই। এই ঘটনা এ রাজ্যের তথা দেশের চাকরির জন্য হাহাকারের মর্মান্তিক চিত্রটিকে আরও একবার প্রকাশ্যে নিয়ে এল।

২০১৭-তে মালদহ মেডিকেল কলেজ, ২০১৯-এ কোচবিহার মেডিকেল কলেজ এই পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে ইন্টারভিউয়ে বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিত সহ কয়েক হাজার প্রার্থী এসেছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এর আগে একই রকম ছবি দেখা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং অন্যান্য রাজ্যে। অনেক কম বেতনের ক্লার্কের চাকরি পেতে মরিয়া চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবিএ, এমনকি পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের।

অর্থনীতিবিদরা পর্যন্ত বলছেন, 'কর্মহীনতা সাংঘাতিক জায়গায় পৌঁছেছে। করোনার আগে থেকেই দেশজুড়ে এই অবস্থা। করোনায় দেশের বেকারত্ব ভয়ঙ্কর

সাতের পাতায় দেখুন

প্রকাশিত হয়েছে

শিশু পাচারকারীদের শাস্তির দাবিতে বাঁকুড়ায় ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ

বাঁকুড়ার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী এবং বেশ কিছুজন পাচারকারীর যোগসাজশে একটি শিশু পাচার চক্র গড়ে ওঠে। সম্প্রতি শিশুগুলিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের চিৎকারে সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে অপরাধীদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এর প্রতিবাদে শিশু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতির বিরুদ্ধে ২০ জুলাই বাঁকুড়া শহরে এআইডিএসও, এআইএমএসএস ও কমসোমলের পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এআইডিএসও-র ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

ইয়াস বিধ্বস্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দ্বাদশ শ্রেণির ভর্তির ফি ঃ বালিঘাই ফকিরদাস হাইস্কুলে ১০৮০ টাকা, চকদ্বীপা হাই স্কুলে ৬০০ টাকা, রাজরামচক শিক্ষা নিকেতন ৬০০ টাকা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কলেজের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের এনরোলমেন্ট ফি ঃ বি এ অনার্স (নন ল্যাব) ৬৫০ টাকা, বি এ অনার্স (ল্যাব) ৬৮০ টাকা বি-কম অনার্স ৭১০ টাকা, রসায়ন ১০৭০ টাকা, বটানি ১০২০ টাকা, পরিবেশ বিজ্ঞান ১০২০ টাকা। এমনকি কলকাতার বেশ কিছু স্কুলে ফি কোথাও ১০০০ টাকা, কোথাও কোথাও ২০০০ টাকা ভর্তি ফি আদায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এআইডিএসও। জেলায় জেলায় ঘেরাও-ডেপুটেশন-বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করেছে। ইয়াস বিপর্যস্ত উপকূলীয় অঞ্চলে বহু ছাত্র কমিটি গড়ে উঠেছে। লকডাউনের মধ্যে এই ছাত্র কমিটিগুলি দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। শুধু ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নয়, ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে গড়ে ওঠা আন্দোলনের জয়ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করে ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব করতে বাধ্য হন।

কোচবিহার জেলায় একাধিক স্কুলে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করে কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনের চাপে দার্জিলিংয়ে ডিআই ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ফি মকুবের নির্দেশিকা প্রকাশ করেন। কলকাতায় জেলা স্কুল পরিদর্শক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলি ২৪০ টাকার বেশি ভর্তি ফি নিতে পারবে না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, পরিবহণে ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত রকমের ফি মকুবের দাবিতে ২৬ জুলাই রাজ্যব্যাপী প্রতীকী অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়।

আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটি আন্দোলনে

রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে ২২৪২ জনকে নিয়োগপত্র দিয়েও কাজে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে তাদের নিয়োগের দাবিতে উত্তীর্ণরা ১৯ জুলাই বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু পুলিশ তাঁদের উপর হামলা চালায়।

এই ঘটনার বিরোধিতা করে আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটি ২০ জুলাই হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কমিটির সর্বভারতীয় সহ সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাসের বক্তব্য চলাকালীন অতর্কিতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করে।

কমিটির ৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যায়। কমিটির দাবি— ১) অবিলম্বে পুলিশ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ও লাঠিচার্জে যুক্ত দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে, ২) শূন্যপদ আপডেট করে অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে উত্তীর্ণ সকল কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে।

মৈপীঠে যুবকর্মীর উপর তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠে তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছেই। তারা গত বছর খুন করেছিল এসইউসিআই(সি) নেতা কমরেড সুধাংশু জানাকে। গত ২০ জুলাই যুব নেতা এআইডিওয়াইও-র জেলা সভাপতি সুদর্শন মান্নাকে গুরুতরভাবে আহত ও রক্তাক্ত করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। এলাকায় একচ্ছত্র দাপট কায়েম করতেই তৃণমূলের এই সন্ত্রাস।

এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বলেন, এক সময়ের সিপিএম যারা ২০ বছর এই অঞ্চলের গরিব মানুষের উপরে সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে, তারাই আজকে ছাতা বদল করে তৃণমূলের ছাতার তলায় এসে সেখানে ক্ষমতা দখলের জন্য গণআন্দোলনের কর্মীদের উপরে সন্ত্রাস চালিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখবার চেষ্টা করছে। সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ কমরেড সুদর্শন মান্নার উপর হামলা। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন ও দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান। এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে ২২ জুলাই সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করে এআইডিওয়াইও।

২৪ জুলাই মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস ঘটনাস্থলে যায়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা সম্পাদক জ্ঞানতোষ প্রামানিক, সহ সম্পাদক তমাল মণ্ডল ও গৌরাঙ্গ নস্কর। এলাকা পরিদর্শন করে তাঁরা বলেন, সকাল ৯.৩০ টায় চা খেতে শনিবারের বাজারে গেলে শাসক দলের নেতা হারাধন মান্নার নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন দুষ্কৃতী সুদর্শন মান্নাকে লাঠি বাঁশ দিয়ে মারতে থাকে। মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারান তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় মারা গেছে ভেবে রাস্তার ধারে ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে মৈপীঠ কোস্টাল থানায় স্মারকলিপি দিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। তাঁরা বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষ আচরণ করছে না।

শ্রমিকদের দাবি দিবস পালন

ভ্যাকসিন, ভাতা, খাদ্য, লোকাল ট্রেনের দাবিতে ৭ জুলাই এআইইউটিইউসি-র ডাকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে পালিত হল দাবি দিবস। নানা স্থানে একত্রিত হয়ে হাতে লেখা দাবি সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন হকার, পরিচারিকা, মিড ডে মিল ও আইসিডিএস কর্মী, নির্মাণ ও বিড়ি শ্রমিক, মোটর ভ্যানচালক এবং পরিযায়ী শ্রমিকরা।

ভাড়া নিয়ে নিরপেক্ষ কমিটি চাই

একের পাতার পর

তিনগুণ-এর কাছাকাছি। একই ভাবে দিন দিন বেড়েই চলেছে রান্নার গ্যাস এবং কেরোসিনের দামও। যাকে বাস্তবে, করোনা বিপর্যস্ত জনগণের কাছ থেকে লুট বললেও কম বলা হয়। জনজীবনের এই দুঃসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এত বড় একটা অন্যায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকারও মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

বাস মালিকরা পেট্রল-ডিজেলের অন্যায় এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনও কথাই বলছে না। বরং তেলের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে আরও বিপুল হারে বর্ধিত ভাড়ার অসহনীয় বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেই তারা বদ্ধ পরিকর। রাজ্য সরকারও কেবলমাত্র 'বাসভাড়া বাড়ানো চলবে না' বলে মৌখিক ঘোষণা করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। এদিকে যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া আদায় রুখতে কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না।

এর আগেই এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে লোকাল ট্রেন চালুর দাবি জানানো হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত লোকাল ট্রেন চালালেই দূরত্ব বিধি মেনে সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করা বাস্তবে সম্ভব হত। সেক্ষেত্রে বাসেও 'যাত্রী সংখ্যা কম' বলে বাস মালিকরা ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে যে অজুহাত তুলছে, সে অজুহাত তারা তুলতে পারত না। কিন্তু সে দাবি মানা হয়নি। পেটের তাগিদে কাজের সন্ধান করতে কিংবা চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য স্বল্প বেতনের কর্মীকেও বাধ্য হতে হয়েছে অটো-টোটো সহ অন্যান্য পরিবহণে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে যাতায়াত করতে। এই বাড়তি খরচ আর হয়রানির ফলে, মানুষের উপর সুকৌশলে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে তারা বর্ধিত বাসের ভাড়া মেনে নিতে বাধ্য হয়।

পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বাস মালিকদের ইচ্ছামতো ভাড়া বাড়িয়ে নেওয়ার এই কৌশল ও চাপের কাছে মাথা নত না করে, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও তার উপর ট্যাক্স চাপানোর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার তার সদর্থক ভূমিকা পালন করুক। জনস্বার্থে পেট্রল-ডিজেলের উপর থেকে রাজ্য সরকার অন্তত তাদের চাপানো ট্যাক্স অবিলম্বে প্রত্যাহার করুক। রোড ট্যাক্স কমা এবং যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণে সরকার কার্যকরী ভাবে হস্তক্ষেপ করুক। এস ইউ সি আই (সি)-র সুস্পষ্ট বক্তব্য— কোনও অজুহাতেই জনগণের ঘাড়ে ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপানো চলবে না।

অনিবার্য কারণে 'প্যারি কমিউনের সংগ্রাম' ধারাবাহিক লেখাটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না

কমরেড শঙ্কর সাহা বিপ্লবী জীবনচর্চায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

(বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও এসইউসিআই(সি)-র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা ৩১ মে প্রয়াত হন। ২০ জুন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত অনলাইন স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর পূর্ণাঙ্গ ভাষণটির বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল)

কমরেড প্রেসিডেন্ট ও কমরেডস,

কমরেড শঙ্কর সাহা যদিও বয়সে আমার থেকে ছোট ছিল, তবুও আমি তাঁকে বলতাম আপনার মৃত্যু আমার আগেই ঘটবে এবং আপনার স্মরণ সভায় আমিই বলব। তিনি হেসে বলতেন, 'আমিও সেটা চাই'। আজ সেটাই নিষ্ঠুর বাস্তব হয়ে আমার কাছে এসেছে। আমি এটা আশা করিনি।

কমরেডস, সমগ্র মানবজাতি আজ বিপন্ন। কোটি কোটি মানুষ কোভিড অতিমারিতে সংক্রমিত। এক কোটিরও বেশি মানুষ ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন। আরও বহু জন মারা যাবেন। আমাদের পার্টিও বেশ কিছু মূল্যবান নেতা-সংগঠক ও সদস্যদের হারিয়েছে। এখনও কিছু কমরেড মৃত্যুশয্যায়। যে কোনও সময় তাঁদের বেদনাদায়ক সংবাদ আসতে পারে। কিন্তু এই দুঃখ এবং শোককে আমরা কীভাবে মোকাবিলা করব? সাধারণ মানুষ এসব ক্ষেত্রে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, মন ভেঙে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে মহান নেতাদের মূল্যবান শিক্ষা। মহান লেনিনের মৃত্যুর পর মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, 'শপথ করছি কমরেড লেনিনের শিক্ষা আমরা বাস্তবায়িত করব।' আবার মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর মহান মাও সে তুং বলেছিলেন, 'শোককে শক্তিতে পরিণত কর'। এবার আমি মহান প্রয়াত নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য উদ্ধৃত করব, যা তিনি এই ধরনের কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির নেতা-কর্মীরা কী ভাবে মোকাবিলা করবে তার প্রস্তুতির জন্য বলেছিলেন।

১৯৭৪ সালে কলকাতায় কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিচালনায় একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ওই সময় আমাদের অপর একজন শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। তাঁর ব্লাড ক্যান্সার হয়েছিল। এ নিয়ে আমাদের দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে আমরা বিতর্ক করছিলাম যে এই সময় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির বন্ধ করে দেওয়া উচিত কি না। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল এবং যখন এই বিতর্ক চলছিল সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই বৈঠকে আসেন। আলোচনায় ঢুকে বলেন, 'তোমরা যখন ময়দানে সংগ্রামে থাকবে যদি শোনো আমি মারা যাচ্ছি, তখন বিপ্লবী হিসেবে তোমরা কি সংগ্রাম বন্ধ করে দেবে? না, তা বন্ধ করা যায় না।' কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণ সভায় কমরেড ঘোষ বক্তব্য রাখেন। ওই ভাষণ 'এক মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য' শিরোনামে শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলিতে আছে, আমি পরে তার থেকে পড়ে শোনাব।

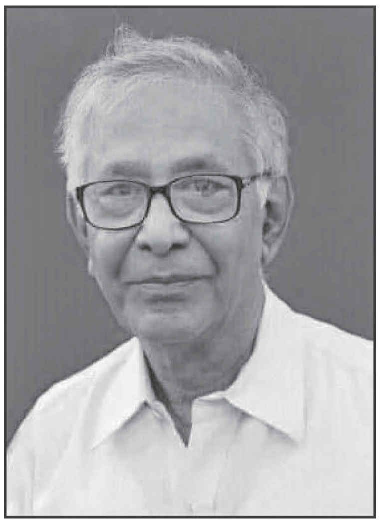

কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন স্মরণ সভায় তাঁর কথাগুলো রাখছিলেন, আমরা অনুভব করেছিলাম এটা আমাদের প্রতি একটা বিরাট শিক্ষা ও বার্তা। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর মৃত্যু আমাদের জীবনে কী গভীর শোক ডেকে আনবে, তিনি আমাদের মনকে সেই দুঃখের দিনের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি পয়েন্ট বলব, যার দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন বিপ্লব ও দলের সঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ কতটা একাত্ম ছিলেন।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর জীবনাবসানের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে কলকাতা শহরে যে মিছিল হয়েছিল, তার শৃঙ্খলা এবং যে নীরব শোকের ছবি সেই মিছিলের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরিয়েছিল তা মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু কমরেড ঘোষের কাছে রিপোর্ট পৌঁছেছিল যে ওই মিছিলে গ্রাম থেকে আসা অল্প সংখ্যায় কিছু নতুন মানুষ ছিলেন, যারা মিছিলের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেননি। পরের দিন অফিসে কমরেড ঘোষ আমাকে বললেন, 'পরবর্তী কালে তোমরা যখন এ ধরনের শেষযাত্রার মিছিল সংগঠিত করবে, তখন যে সব জায়গায় গ্রাম থেকে নতুন চাষি মানুষরা থাকবেন তাদের সাথে পার্টি ভলান্টিয়ার দিও যাতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়।' দেখুন, এমনকি তাঁর মরদেহ নিয়ে যে মিছিল হবে সেটাও যাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রশংসার সৃষ্টি করে এবং পার্টি ও বিপ্লবের প্রতি জনগণের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে, সেই চিন্তাও তিনি করেছেন। সেই ভাবনাও তাঁর ছিল। এখন আমি আপনাদের সামনে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের সেই অংশটি পড়ে শোনাব। অধিকাংশ কমরেডই এটা শুনেছেন। মূল ভাষণ বাংলাতেই ছিল— "রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি তো উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। এ যেমন একদিকে কোমল, আবার এই রাজনীতির মধ্যেই রয়েছে কঠোর বাস্তবতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর এবং কঠিন কর্তব্যপরায়ণতা। শোকের জন্য আমাদের কাজ বসে থাকতে পারে না। বাইরের দিক থেকে রাজনীতির আচরণটা এমনই নিষ্ঠুর। কিন্তু এই বাইরে থেকে যেটাকে নিষ্ঠুর মনে হয়, তার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ শোকোপলব্ধির তাৎপর্য। তাই বড় বিপ্লবীরা গভীর শোকের মধ্যেও তাদের কাজ ঠিক করে যায়। কাজ তাদের করতেই হয়। কাজ করার ব্যাপারটা তাদের কোনও অবস্থাতেই গোলমাল করা চলে না।"

কমরেড শিবদাস ঘোষের সেদিনের এই আবেদন সমগ্র পার্টিকে প্রয়াত নেতা শ্রদ্ধেয় কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে এক মানুষের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এইভাবেই আমরা ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলাম। আজ এবং ভবিষ্যতেও এ ভাবেই আমাদের শোককে দেখতে হবে এবং মোকাবিলা করতে হবে।

আমি যতদূর জানি, কমরেড শঙ্কর সাহা ১৯৬৩ সালে পার্টিতে যুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় দমদম অঞ্চলে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাথে কাজ করতেন কমরেড তপন রায়চৌধুরীর দাদা কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী। কমরেড তপন রায়চৌধুরীও সাহায্য করতেন। তাঁরা ওখানে ক্লাব, কোচিং ক্লাস, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছাত্র-যুব উৎসব ইত্যাদি সংগঠিত করতেন। শঙ্কর সাহা এগুলিতে যোগ দেন এবং তাঁকে পার্টির সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দেন কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী। কমরেড শঙ্কর সাহা তখন জেশপ কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সম্ভবত কোনও উচ্চপদেই। এই ভাবে দমদম অঞ্চলে কাজ করার সময় তিনি দেখেন সুদসন কারখানায় মালিকরা শ্রমিকদের গুণ্ডা দিয়ে নির্দয়ভাবে মারছে। এটা তাঁর মনকে স্পর্শ করে। তিনি তা আটকাতে এগিয়ে যান, প্রতিরোধ সংগঠিত করেন এবং ওই অত্যাচার বন্ধ করেন। এই পথে ওই কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি হয়। লক্ষ করুন পার্টি কিন্তু তাঁকে ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার জন্য বলেওনি, নিয়োগও করেনি। তিনি নিজের উদ্যোগে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা ভেবে ওই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের কাজ শুরু হয়। দমদমের একটি বড় কারখানা হিন্দুস্তান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিতে অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে ও উদ্যোগে সেই সময়ে দমদমে অনেক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হয়। সিপিএম বাধা দিয়েছিল, পুলিশের সহায়তায় তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল। পুলিশের সাহায্যে কংগ্রেসও আক্রমণ চালিয়েছিল। এ ধরনের সব আক্রমণকে কমরেড শঙ্কর সাহা সাহসের সাথে মোকাবিলা করেছেন। এই পথেই তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক রূপে বিকশিত হন। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকেই তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিসে চলে আসেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মে আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে ওই ট্রেড ইউনিয়নে আরও একজন সিনিয়র কমরেড ছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়ত তাঁর নাম শোনেননি। তাঁর নাম গণেশ দাশগুপ্ত। তাঁরা দুজনেই অফিসে থাকতেন, ওখানেই রান্না করে খেতেন, অফিসের বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটাতেন। বহু দিন, মাস, বছর এভাবেই কেটেছে। কমরেড শঙ্কর সাহা তাঁর বেতনের সবটাই পার্টিকে দিতেন। কিছুকাল পর তিনি স্বেচ্ছাবসর নেন এবং প্রাপ্ত পুরো টাকাই পার্টি ফান্ডে দিয়ে দেন।

এখানে আমি আর একটি বিষয় বলব, যা অধিকাংশ কমরেডই জানেন না। ওই সময় ট্রেড ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ছিলেন ফটিক ঘোষ। আপনারা জানেন, তাঁর অনৈতিক, অধঃপতিত, পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য পার্টি তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। তাঁর বহিষ্কারের পর প্রয়াত নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী একটি সভায় চোখের জলে বলেছিলেন, ফটিক ঘোষের বহু দোষের জন্য ফটিক ঘোষকে দলে যুক্ত করতে কমরেড শিবদাস ঘোষ নিষেধ করেছিলেন। কমরেড নীহার মুখার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষকে অনুরোধ করেছিলেন ফটিক ঘোষকে শোধরানোর একটা সুযোগ নীহারবাবুকে দিতে— একথা বলেই চোখের জলে কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। ফটিক ঘোষ অত্যন্ত ধূর্ত লোক ছিল, আত্মসর্বস্ব, আমলাতান্ত্রিক, আধিপত্যবাদী ও স্বৈরাচারী প্রবণতার মানুষ ছিল। শ্রমিকদের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে মালিকদের সঙ্গে, নানা মহলের অফিসারদের সঙ্গে মাখামাখি করত। ফ্রন্টের আপেক্ষিক স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে সে পার্টি এবং ফ্রন্টের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নকে নিজস্ব খাসতালুক বানিয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর সাহা তাঁর অধীনেই কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি পার্টির নির্দেশ কার্যকর করবার জন্যই কঠিন সংগ্রাম করতেন। ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা কার্যকর করার জন্য লড়াই চালাতেন। তখন ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কার্যত দুই লাইন ছিল। একটা ফটিক ঘোষের লাইন যেটা পার্টির শিক্ষার বিরোধী, আর একটা পার্টি শিক্ষার অনুসারী লাইন যেটা কমরেড শঙ্কর সাহা কার্যকর করতেন। ফটিক ঘোষ যেহেতু সেক্রেটারি ছিল, তাই শঙ্কর সাহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পার্টি লাইন কার্যকর করতে হত এবং ফটিক ঘোষের দুষ্ট প্রভাব থেকে অন্যান্য কমরেডদের রক্ষা করতে হত। যদিও এই দুই লাইনের সংঘাত ছিল বিরোধাত্মক, তবুও কমরেড শঙ্কর সাহা কখনও এই বিরোধকে সামনে আসতে দিতেন না, যাতে অন্যান্য কমরেডরা মনোবল না হারায়। এ ছিল অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম। কোনও উচ্চস্তরের নেতা তাঁকে এই দায়িত্ব দেনওনি। আমি আপনাদের

চারের পাতায় দেখুন

কমরেড শঙ্কর সাহা শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলার কঠিন কাজটা করতেন

তিনের পাতার পর

বলতে পারি, কমরেড শঙ্কর সাহা নিজস্ব প্রত্যয় ও উপলব্ধি থেকেই এই কাজ করেছেন। এই জায়গা থেকেই কমরেড শঙ্কর সাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শুরু হয়। আমি জানি, কত ধৈর্য, বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রত্যয় থেকে তিনি এ কাজ করেছেন এবং ফটিক ঘোষের প্রভাব থেকে ট্রেড ইউনিয়নকে রক্ষা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয় আপনাদের বলব। এই ঘটনা অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ফটিক ঘোষ অত্যন্ত অনৈতিক একটি কাজ করেছিল। একজন মহিলা কমরেড যিনি কলেজ জীবনে আমাদের সংগঠন পরিচালিত একটি ছাত্র ইউনিয়নে সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি খাদ্যদপ্তরে চাকরিতে যোগ দেন। পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সাথেও তিনি যুক্ত হন। তবে তিনি কখনই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন না। তাঁকে বিবাহ করবেন বলে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন ফটিক ঘোষ। কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য এক মহিলাকে গ্রহণ করে। সবটাই ঘটে পার্টি নেতৃত্বের অজ্ঞাতে। ফটিক ঘোষ পরে ওই কমরেডকে অস্বীকার করলে সে প্রায় পাগলের মতো হয়ে যায়, কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছে ছুটে যায়। তাঁর মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁকে রক্ষা করার জন্য কমরেড শঙ্কর সাহাকে অনুরোধ করেন। কমরেড শঙ্কর সাহা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিছুটা খিটখিটে মেজাজ ছিল। তাঁর কিছু মানসিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবত আগেকার এই ঘটনার জন্য। কিন্তু তিনি পার্টি এবং শঙ্কর সাহাকে ভালোবাসতেন। আমি মনে করি, বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায় শঙ্কর সাহা তা পাননি। কিন্তু এ নিয়ে কোনও দিন কোনও অভিযোগ করেননি। সমস্ত ঝড়ঝাপটা তিনি নীরবে একা সহ্য করেছেন। এটাও কমরেডদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত।

এখন আমি আপনাদের বলব, আমাদের দেশে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আছে, কংগ্রেস ও বিজেপি পরিচালিত আছে, সিপিএম-সিপিআই পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নও আছে। আমাদের সংগঠন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বলিয়ান এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত। কংগ্রেস-বিজেপির ট্রেড ইউনিয়ন কার্যত বুর্জোয়াদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। শ্রমিকদের ঠকাবার জন্য বুর্জোয়াদেরও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রয়োজন। সাধারণ শ্রমিকরা অধিকাংশই নিরক্ষর, রাজনৈতিক ভাবে অসচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ নয়। বুর্জোয়া আদর্শ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সঙ্গে নানা সূতোয় এই শ্রমিকদের জীবন বাঁধা। বুর্জোয়ারা এজেন্ট বা দালাল ভাড়া করে, যারা শ্রমিকদের মাঝে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে কাজ করে শ্রমিকদের বিপথচালিত করতে পারে, বিভ্রান্ত করতে পারে, কানুনিবাদ-অর্থনীতিবাদের বেড়াজালে তাদের বেঁধে ফেলতে পারে এবং বুর্জোয়া সংস্কারবাদী রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত রঙিন ছবি তুলে ধরে শেষ পর্যন্ত তাদের বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির কানাগলিতে ঠেলে দিতে পারে। এর ফলে আজ সাধারণ শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা কী? পুঁজিবাদী শোষণ যন্ত্রের দ্বারা তারা শোষিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে ও কার্যত ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু তারা মনে করে, ধনী ও গরিবে বিভক্তি, শোষক ও শোষিতের বিভাজন, মালিক ও শ্রমিকের দুই ভাগ— এ সবই ঈশ্বরপ্রদত্ত, চিরন্তন। সব কিছুই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তার উপর তারা ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা, জাত-পাত ইত্যাদির দ্বারাও বিভক্ত। তাদের শিক্ষিত, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম। বুর্জোয়া মালিকরা যদি কখনও কোনও ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে পায়, তবে তাকে ঘুষ দিয়ে ও নানা উপায়ে চতুরতার সাথে কিনে নেয়। বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রকাশ্যেই বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজ করে। কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বামপন্থী বুলি আউড়ে তলে তলে বুর্জোয়াদের সেবা করে। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব হল, বুর্জোয়া এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ক্রিয়াকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া, তাদের প্রভাব থেকে শ্রমিকদের মুক্ত করে আনা ও বিপ্লবী লাইনে তাদের সংগঠিত করা। এই প্রসঙ্গেই আমি কিছু শিক্ষার কথা বলব, যা সকল বিপ্লবীদের কাছে অনুসরণীয় এবং কমরেড শঙ্কর সাহা যা অনুসরণ করেছেন। প্রথমেই আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে কমরেড লেনিন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের কিছু শিক্ষা পড়ে শোনাব।

লেনিন বলেছেন, "শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা একমাত্র বাইরে থেকেই নিয়ে আসা যায়"। এখানে বাইরে থেকে অভিব্যক্তিটার মানে হল, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভেতর থেকেই এই চেতনা জন্ম নেয় না। একে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়। সে জন্যই তিনি বাইরে থেকে কথাটা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সমস্ত দেশের ইতিহাস দেখায় যে, শ্রমিক শ্রেণি শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় কেবল ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ তারা ইউনিয়ন তৈরি করা, মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং প্রয়োজনীয় শ্রম আইন পাশ করানোর জন্য সরকারকে বাধ্য করার চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা নিজের থেকেই উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে দর্শনগত, ইতিহাসগত এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি থেকে, যা ব্যাখ্যা করেছেন, উপস্থিত করেছেন মালিক শ্রেণির শিক্ষিত প্রতিনিধিরা, বুদ্ধিজীবীরা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস, এঙ্গেলস তাঁদের সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।' কিন্তু তাঁরা শ্রেণিচ্যুত বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হয়েছিলেন। 'আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেতনা কেবলমাত্র গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জন্ম নিতে পারে। সর্বহারা শ্রেণি বিজ্ঞানের বাহক নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই, শ্রেণিচ্যুত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই তার বাহক। এই অংশের সদস্যদের চিন্তা থেকেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি এবং তারাই এটা সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে বুদ্ধিগত দিক থেকে বিকশিত অংশের কাছে এই চিন্তা দেন এবং চিন্তায় উন্নত এই সর্বহারারাই সর্বহারা শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে যেখানে পরিস্থিতি তাদের সাহায্য করেছে, এই চিন্তা বহন করে নিয়ে যান। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক চেতনা হচ্ছে এমন কিছু যা সর্বহারা শ্রেণিসংগ্রামের ভিতর থেকে আপনাআপনি জন্ম নেয়নি, তাকে বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়েছে।' এই হচ্ছে লেনিনের বক্তব্য।

এখন আমি কমরেড শিবদাস ঘোষকে উদ্ধৃত করব— "মার্কস সূচনা থেকেই যে প্রশ্ন রেখেছেন, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কেন যোগ দেবে? তারা যোগ দেবে কারণ, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে সাম্যবাদ শেখার বিদ্যালয় — কমিউনিজমে শিক্ষিত হবার, শিক্ষা গ্রহণ করবার একটা বিরাট রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। এই হল ট্রেড ইউনিয়ন। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে যদি এই শিক্ষাশিবির হিসাবে দেখা না হয়, এগুলো রাজনীতি চর্চার একটা প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে না ওঠে তা হলে এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অস্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির বদলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষপর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ বা সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে থাকে।" অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই ট্রেড ইউনিয়ন প্ল্যাটফর্ম থেকে সমষ্টিগত ভাবে লড়াই করতে গিয়ে শ্রমিকরা ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার এবং সত্যের সন্ধান করার সুযোগ পায়। দৈনন্দিন লড়াই পরিচালনা করতে গিয়ে এই চেতনা তাদের মধ্যে দেখা দেয় কেন বিপ্লব ছাড়া শোষণমুক্তি সম্ভব নয়। এভাবে একমাত্র বিপ্লবীরাই শ্রমিকদের এই চেতনায় শিক্ষিত করতে চায়। কেবলমাত্র সেই শ্রমিকরাই দুনিয়াকে বদলাতে পারে যারা এই ধরনের গুণসম্পন্ন বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। এবং সেটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নয় অথবা স্লোগানে নয়, আচার-আচরণে এবং জীবন-যাপনে, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে, রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এই হল কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা।

মহান লেনিন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাগুলি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমরেড শঙ্কর সাহাকে গাইড করেছে। এটা অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম ছিল। পার্টির অন্যান্য আরও নানা ফ্রন্ট রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে শ্রমিকরা সর্বদা অফিসে আসে চার্জশিটের কী জবাব হবে তা জানতে, পুলিস কেস হলে কী করণীয় তা বুঝতে এবং কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে তা খোলার জন্য কী করতে হবে তা জানতে। শ্রমিকরা প্রতিদিন আসে তাদের সমস্যা নিয়ে, ইউনিয়ন নেতারা আসে তাদের সমস্যা নিয়ে এবং নেতাকে তাদের গাইড করতে হয়। সাধারণত শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ থাকে না, রাজনৈতিক আলোচনায় ঢুকতে চায় না। রাজনৈতিক ভাবে তাদের শিক্ষিত করা একটি কঠিন কাজ। কিন্তু কমরেড শঙ্কর সাহা মহান নেতাদের শিক্ষাগুলি স্মরণে রেখে এই কাজটি নিয়মিত করে গেছেন। অন্যান্য ফ্রন্টকে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না। এই কাজগুলি করতে করতেই কমরেড শঙ্কর সাহাকে পড়াশুনো করতে হয়েছে। কমরেড রাধাকৃষ্ণ-র কাছ থেকে শুনলাম, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও বলেছেন, শ্রমআইনগুলি সম্পর্কে কমরেড সাহার গভীর জ্ঞান ছিল। এর জন্য তাঁকে পড়াশুনো করতে হয়েছে। বিভিন্ন শ্রম ট্রাইবুনালে শুনানির সময় তিনি শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা এমন দক্ষতার সাথে উপস্থিত করতেন, যা শুনে অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক ম্যানেজাররা, মালিকরা ও লেবার অফিসাররাও চমৎকৃত হতেন এবং আইনগত ভাবে তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। কমরেড সাহা শ্রমআইনগুলি এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার পাশাপাশি পার্টির পুস্তক ও পত্রপত্রিকাও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন।

অনেকে জানেন না, কমরেড শঙ্কর সাহা তত্ত্বগত দিক থেকে পরিণত ছিলেন। প্রায়ই আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হত। মার্কসীয় দর্শন, বিপ্লবী রাজনীতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। নিয়মিত এ সব নিয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু মিটিং কিংবা ক্লাসে সাধারণত তিনি মুখ খুলতেন না। এটাই ছিল তাঁর স্বভাব। সবসময় অন্যদের বলার সুযোগ দিতেন। প্রয়োজন হলে তবেই তিনি বলতেন— বলতেন খুব সংক্ষেপে মূল পয়েন্টগুলিকে তুলে ধরে।

বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই অধঃপতিত হয়েছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ এমনই এক জায়গা যেখানে মালিকরা নানা ভাবে— তোষামোদ করে, ঘুষ দিয়ে, প্রশস্তি করে, বিলাসবহুল হোটেলে ভাল ভাল খাবার খাইয়ে— ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রভাবিত করে। সেই পরিবেশেই থাকতেন কমরেড শঙ্কর সাহা। কিন্তু মালিকরা কোনও ভাবেই তাঁকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি নিজের সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ট্রেড ইউনিয়নের যে কমরেডরা কমরেড শঙ্কর সাহার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। দেখেছি, তাঁর সম্পর্কে এঁদের মনে কী প্রবল আবেগ ও শ্রদ্ধা! কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, 'নেতা দু'ধরনের হয়। একদল আছেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে যাঁরা কোনও কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন। যান্ত্রিক ভাবে অন্যেরা তাঁদের মেনে নেয়। আরেক দল আছেন— নির্বাচিত হোন আর না-ই হোন— নিজের চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও বিপ্লবী শিক্ষার প্রগাঢ় জ্ঞানের কারণে কমরেড ও শ্রমিকরা হৃদয়ের গভীর থেকে যাঁদের শ্রদ্ধা করেন, ভরসা করেন। এঁরাই হলেন প্রকৃত নেতা।' আমি বুঝেছি, কমরেড শঙ্কর সাহা এই দ্বিতীয় পথ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

যায়, কুকুর বেড়ালের মত লাঠি দেখলেই পালায়, আবার নিজের হাতে লাঠি থাকলে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না — তাদের ওপর হামলা করে, তা হলে এই মানুষগুলোর দ্বারা বিপ্লব হয় নাকি? এই যে রক্তলোলুপ প্রবণতা, এতো বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তি। এর দ্বারা সমাজপরিবেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট মানসিকতা তৈরি হয়। মজুর আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে আজ এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর আচরণ চলছে। শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধে নয়, দলের অভ্যন্তরে দলের বাইরে যা কিছু কুৎসিত, যা মানুষকে বড় করতে, মহৎ করতে সাহায্য করে না, সেগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম হওয়া উচিত এবং এই সংগ্রাম শুধু বাইরের লোকের বিরুদ্ধেই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও।

নেতা হওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? নেতা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আপনাদের আন্দোলনে আপনারা যত বেশি সংখ্যক নেতা তৈরি করতে পারবেন, আপনাদের কাজের অগ্রগতি তত দ্রুত হবে।

কিন্তু, দেখা গেল নেতৃত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নেতা কতকগুলি মারাত্মক দোষের শিকার বনে গেল। নানা রকম ব্যক্তিবাদের শিকার, লোকপ্রিয় আচরণের শিকার বনে গেল। এই কথাগুলির মানে আপনাদের বুঝতে হবে। লোকপ্রিয়তা মানে এমন সব আচরণ যা করলে সহজে নাম করা যায়— অর্থাৎ ঢং, চলাফেরা, ওঠা-বসা, কথা বলা, ঢিলেঢালা কায়দা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে সে সাধারণ লোকের কাছ থেকে সহজে প্রশংসা আদায় করে। এগুলোর দ্বারা সে কী করে? সে যেমন তার নিজের ক্ষতি করে, তেমনই আন্দোলনের মধ্যে নেতার যে কাজটি করা দরকার ঠিক তাঁর বিরুদ্ধ জিনিসটি করে। অর্থাৎ, লোকে যদি তাঁর সংস্পর্শে আকৃষ্ট হয় তা হলে তা ভুল ভাবে হয়। সাধারণভাবে সমাজ পরিবেশের যে নিম্ন মানসিকতা ও রুচির শিকার বনে যায় জনতা, তার সঙ্গে নেতার আচরণ-চলাফেরার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও একটা মিল খুঁজে পায় বলে তারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে, জনতার মধ্যেও ঢিলেঢালা ভাব আসে। তাদের নেতাদের তারিফ করাটাও হয় বাজে ধরনের। তার ফলে এইসব নেতার সংস্পর্শে থাকার মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক চেতনার মান ওঠার বদলে আরও নিচের দিকে নামতে থাকে।

ফলে, নেতা আমাদের চাই। কিন্তু, এমন নেতা চাই, যে নেতার মতো আচরণ করে, যার দায়িত্ববোধ আছে, যে যেকোন অবস্থায় নিজেকে সামাল দিতে পারে এবং অপরকে পথ দেখাতে পারে। যে নিজের আচরণের দ্বারা অন্যকে এই শিক্ষা দেয় যে, অসুবিধা হলেও, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হলেও নেতার দায়িত্ববোধ আছে; একজন সাধারণ লোকের মতো অসুবিধার দোহাই দিয়ে সমস্যা আছে বলে সে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। তাকে বুঝতে হবে, সে একজন সাধারণ মানুষ নয়। সে জানে কীভাবে সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয়। সেজন্য নেতা বলতে শুধু নাম বোঝায় না— নেতা মানে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অর্জন করার সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চালিয়ে যেতে হয়, নেতা মাত্রকেই তা জীবনভোর করতে হয়। এমনি এমনি যে তা অর্জিত হয় না, সেটা অনেকে ধরতেই পারে না।

বর্তমান সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের যে শ্রেণিসংগ্রাম চলছে সেই শ্রেণিসংগ্রাম বা শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রভাব আমাদের চিন্তাভাবনা-মানসিকতার ক্ষেত্রে, রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়তই কাজ করে চলেছে। শ্রেণিসংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, আন্দোলনের ময়দানে মজুর এবং মালিকের যে লড়াই চলছে শুধুমাত্র সেইখানেই নয়— ভাবগত ক্ষেত্রেও মজুর-মালিকের লড়াইটা হাজির হয়েছে এবং আপনারা চান বা না চান তা আপনাদের মনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। সেই মনের একটা অংশ মালিকের, একটা মজুরের। নিয়ত মন কখনও আপনাকে মালিকের বুদ্ধি জোগায়, আবার কখনও বা আপনাকে মজুরের বুদ্ধি জোগায়! এইভাবে আমাদের সমাজে শ্রেণিসংগ্রাম বাস্তবত অবস্থান করে। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজপরিবেশের ভাবনাধারণাগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই আপনাদের মধ্যে এসে বর্তায়। কোনও নেতা বা কর্মীই নিজেকে এই সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারে না। পারে না বলেই প্রতিনিয়ত যত বড় উঁচুদরের নেতাই হোন না কেন তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজেকে রক্ষা করতে হলে তাঁকে সবসময় বুঝতে হয় যে, তাঁর মধ্যে যে মানসিকতা, চালচলন, স্টাইল ইত্যাদি প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে সেগুলো বিপ্লবী জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কিংবা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এই সাবধানতা সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে অবিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা আসতে পারে এবং এলেই যে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল তাও নয়। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে, আপনারা ঠিক সময়ে তা ধরতে পারলেন কি না এবং সময়মত তা শোধরাতে সক্ষম হলেন কি না। এটাই আসল কথা। আপনাদের নিজেদের মধ্যেকার অবিপ্লবী চিন্তাভাবনাকে যদি আপনারা নিজেরা ধরতে পারেন তবে সেইটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ধরতে পেরে হয়তো নিজেকেই নিজে ছি ছি করলেন এবং তার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তাও করলেন। কারণ, বাইরের লোকলজ্জা একজন বিপ্লবীর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না। নিজের ভেতর থেকে লজ্জাটাই আসল কথা। এটাই একজন বিপ্লবীর প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। তা না হলে বাইরের লোক বড় করলে আমরা বড় হব, বাইরের লোক লজ্জা দিলে আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব। এ হলে একজন বিপ্লবী এক পা-ও চলতে পারবেন না। কারণ, বিরুদ্ধ পরিবেশে একজন বড় বিপ্লবীর গায়েও সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে, অপরের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থুথু ছেটাতে পারে। তার জন্য বিপ্লবী ছোট হয়ে যায় কি? এমনকী মানুষ তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, রাস্তায় পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে, মেরে ফেলতে পারে সেই মানুষগুলো যাদের জন্য সে সর্বস্ব দিতে বদ্ধপরিকর। তার দ্বারা বিপ্লবীর বেইজ্জতি এবং অসম্ভ্রম হয় কি? না। পুলিশ যদি একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর মত বড় মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানা লক-আপে পেটায় তাতে যেমন তাঁর বেইজ্জত হয় না, আবার পুলিশ যদি তাঁকে 'স্যার'ও বলে তাহলেও তাঁর সম্মান বেড়ে যায় না। যেসব বিপ্লবীরা এগুলোকেই মান-অপমানের ক্ষেত্রে বড় কথা বলে মনে করেন, তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। তাঁরা হয়ত জানেন না যে, এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ এবং বুর্জোয়া সমাজের 'অহম' যা নানা মূর্তি ধরে ভোল পাল্টে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। আমরা তো প্রফেসর হতে চাইনি, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইনি, পয়সা কামাতে চাইনি, নাম করতে চাইনি— আমরা বিপ্লবী হতেই চেয়েছি। কিন্তু, বিপ্লবী হতে চেয়েও 'স্যার' শুনলে একটু গর্ব হয়, আর পুলিশ লক-আপে পেটালেই বেইজ্জত হয়— বিপ্লবীর ইজ্জত, বেইজ্জতের ধারণা এরকম নয়। তাঁর ইজ্জত, বেইজ্জত তাঁর নিজের মধ্যে। তা না হলে তো মানুষ ওপরে তুললেই তাঁরা উপরে উঠবেন এবং মইটা কেড়ে নিলেই ধুপ করে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলবেন। এই করে কোনও বিপ্লবীর চলতে পারে না। এইসব চেতনা এবং উপলব্ধিগুলো কর্মীদের মধ্যে এনে দিতে হবে। এনে দিলেই তারা সমস্ত প্রতিকূলতা এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা পাবে।

তাই বিপ্লবী হিসাবে, একজন কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রাম একটি কঠিন এবং জটিল সংগ্রাম। যেমন, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে জনগণকে, শ্রমিকশ্রেণিকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে জনতাকে সচেতন করে জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিগুলি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে বিপ্লবের আঘাতে ভাঙতে হবে— এত কথা একজন বিপ্লবী কর্মী জানার পরেও দেখা গেল যে, যখন তাঁর নিজের চাকরি চলে গেল তখন উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছেন। বিপ্লব, পার্টি, ইউনিয়ন তখন তাঁর সব গোলমাল হয়ে গেল। অর্থাৎ, যতক্ষণ নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁর একটা চাকরি ছিল ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে বিপ্লবটাও ছিল। এ কথাটা তিনি একবারও ভাবেননি যে, পার্টি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে কখনও তাঁর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নও তো আসতে পারে। শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর চাকরি যদি যায়ও তা হলেও তিনি শ্রমিক ইউনিয়নই করবেন এবং শ্রমিকেরা তাঁকে যে ভাবে রাখবে তিনি সেইভাবেই থাকবেন। এত কথা কর্মীটি এর আগে ভাবেননি। অনেকে অনেক কথা জানেন কিন্তু ভাবেন না যে, কোনও একজন কর্মী যদি ইঞ্জিনিয়ারও হন তা হলেও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য, মেলামেশার সুবিধার জন্য দরকার হলে তিনি একটা কুলির কাজ বা বদলি শ্রমিকের কাজ নিয়েও কারখানায় ঢুকবেন।

অথচ, আমাদের এখানে কী দেখা যায়? শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনে কোনও ইঞ্জিনিয়ার কর্মীকে একটি চাকরি করতে হবে বললে তিনি হয়তো তার পেশার উপযুক্ত কোনও কাজ পাবার চেষ্টা করেন। আর না পেলে বারবার এসে বলেন, 'কী করব, কাজ পাওয়া যাচ্ছে না।' অর্থাৎ, কায়িক শ্রমের কাজ না করার যে মানসিক গঠন তাঁর রয়েছে তিনি তার শিকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে একটা লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কী করে তিনি কায়িক শ্রমের কাজ করেন? তাঁর পেশার সঙ্গে খাপ খায় এরকম একটা কাজের বন্দোবস্ত যদি করে দেওয়া যায়, তা হলে সেটা তিনি করবেন। অর্থাৎ, কাজটা করে তিনি বিপ্লবই করবেন, কিন্তু সে কাজটাও তার একটু মনোমতো হওয়া দরকার। কাজটা মনোমতো যদি না হয়, তা হলে বিপ্লবের জন্য যা করা দরকার তা তিনি করতে পারেন না। এই যে মানসিকতা, যুক্তি এবং দেখবার ভঙ্গি— এসব যুক্তিধারা এবং ধারণাগুলি আসছে কোত্থেকে? বিপ্লবের এত কথা জানলেও এই চিন্তাগুলো তাঁর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তার পাশাপাশি এই কারণে চলছে যে, এই বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সেকেলে ভাবনাধারণাগুলি জীবনযাত্রার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে তার প্রতিও তাঁর আগ্রহ কম নয়। এইভাবেই শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রভাব ভাবগত ক্ষেত্রেও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই বর্তাচ্ছে। ফলে, একটি বিপ্লবী কর্মীকে এ সম্পর্কে সবসময়ই সচেতন থাকতে হয় এবং বিপ্লবী হিসাবে জীবনকে গড়ে তোলার জন্য নিয়ত সচেতন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়।"

সিএএ-র বিরুদ্ধে হাওড়ায় সভা

ধর্মের ভিত্তিতে সিএএ চালুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, হাওড়া শাখার পক্ষ থেকে ১২ জুলাই হাওড়া ময়দানে প্রতিবাদ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মহম্মদ শাহনওয়াজ। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি মাজহার উল হক এবং হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী আবরার আহমেদ ও পদ্মলোচন সাহু সহ অন্যান্যরা। জনজাতি মানুষদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নিয়োজিত স্ট্যান স্বামীর হত্যারা বিরুদ্ধেও সভায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

ত্রাণকাজে সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

জুন ও জুলাই মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন ইয়াস বিধ্বস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী, কুলতলি, দেউলবাড়ি, মৌসুনি দ্বীপে এবং পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণি এলাকার সিলামপুর গ্রামে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন শুভাশীষ দাস, সুনির্মল দাস, নারায়ণ বর্মন, অরূপ মণ্ডল, আকসারুল ইসলাম খান, ইন্দুভূষণ গায়েন, শম্পা পাল, বিমান হালদার প্রমুখ। ত্রাণকাজে সহায়তা করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

কমরেড সাহা সিনিয়র, জুনিয়র সকলেরই সমালোচনা গ্রহণ করতেন

চারের পাতার পর

ধরেই একজন সত্যিকারের নেতা হিসাবে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। ওই কমরেডরা গভীর শ্রদ্ধা, আবেগ ও চোখের জলে আমাকে বলেছেন, আমরা আমাদের পিতাকে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় অভিভাবককে হারালাম। কমরেড শঙ্কর সাহা শুধু একজন নেতা ছিলেন না, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে চরিত্রের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছিলেন, যেগুলি উদাহরণ হিসাবে রয়ে যাবে। ওই কমরেডরা আমাকে বলেছেন, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক— যে কোনও মিটিংয়ে যোগদান করার আগে যখন প্রস্তাবের খসড়া তিনি তৈরি করতেন, সেই খসড়া সকলের বিবেচনার জন্য রাখতেন, মতামত দিতে বলতেন। প্রয়োজন হলে অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মিটিংয়ে অন্যদের কথা বলার, মতামত ও পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ দিতেন। আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় লাগিয়ে ফেলতেন। কিন্তু কমরেড শঙ্কর সাহা ধৈর্যের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শুনতেন এবং তারপর ১৫-২০ মিনিট বা ৩০ মিনিট সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত টানতেন। সেই সিদ্ধান্তও হত চমৎকার। কমরেডরা আমাকে বলেছেন, তাঁরা কেউ যদি কোনও ভুল করে ফেলতেন, এমনকি সে ভুল যদি মারাত্মকও হত, তা সত্ত্বেও খুব কম সময়েই তাঁকে রাগতে দেখা গেছে। কঠিন কথা বলে কোনও দিন কাউকে তিনি আঘাত করেননি, আহত করেননি। কমরেডটিকে শেখানোর জন্য অত্যন্ত শান্তভাবে, সহানুভূতির সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন। জুনিয়র কমরেডদের কখনও তিনি বকাবকি করতেন না। কোনও কমরেডই, এমনকি যাঁরা আমাদের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্তও নন, তাঁরাও খুব সহজে কমরেড শঙ্কর সাহার কাছে আসতে পারতেন, নিজের সমস্যা খুলে বলতে পারতেন। তাঁরা কখনও কোনও বাধা অনুভব করেননি। কমরেডরা আমাকে জানিয়েছেন, শঙ্কর সাহা শুধু সিনিয়রদের নয়, জুনিয়রদের সমালোচনাও গ্রহণ করতেন এবং তা করতেন হাসিমুখে। (কমরেড শঙ্কর সাহার প্রতিকৃতির দিকে দেখিয়ে) এই দেখুন তাঁর মুখ— কত শান্ত, সৌম্য। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা— ‘‘আপনি যদি হঠাৎ এমন কোনও অসুবিধার সামনে পড়েন, যা আগে কখনও আসেনি, কিংবা এমন কোনও বিপদ আসে, যাতে আগে কখনও পড়েননি অথবা এমন কোনও সমস্যা আসে যা আগে কখনও মোকাবিলা করতে হয়নি আপনাকে— এসবের মুখোমুখি হয়েও যদি আপনাকে সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে এনে সকলকে নিয়ে একত্রে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করে যেতে হয়, তা হলে প্রয়োজন শান্ত ভাব ও অসীম ধৈর্য।’’ কমরেড শঙ্কর সাহা সব সময় এই শিক্ষা স্মরণে রেখেছিলেন।

এই ভাবে হাসি মুখেই কমরেড শঙ্কর সাহা সমস্ত সমস্যা ও বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুসরণ করে সবসময় তিনি অন্য কমরেডদের ভাল দিক, গুণের দিকগুলি লক্ষ করতেন। তাদের খারাপ দিকগুলি, ত্রুটিবিচ্যুতি— এসব তিনি বড় করে দেখতেন না। কমরেডরা আমাকে বলেছেন, কোনও কমরেড সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে গেলে, সবকিছু শোনার পর ওই কমরেডের গুণের দিকগুলি দেখিয়ে এমনভাবে তিনি আলোচনা করতেন যে অভিযোগকারী কমরেডরা খুশি মনে ফিরে আসতেন। কারও সম্পর্কে নিজের মতো করে ভেবে নেওয়া, এখানে সেখানে তাকে নিয়ে আলোচনা করা— এ সব কখনও তিনি করতেন না। কিছু মনে হলে, তিনি নেতৃত্বের মতামত নিতেন। প্রতিটি কমরেড সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। তাঁর সামনে সকলে খুব সহজ ভাবে, খুশি মনে থাকতে পারত। অনেকে এমনকি এও বলেছেন যে, কোনও কষ্ট বা মানসিক অস্থিরতার সময়ে তাঁরা কমরেড শঙ্কর সাহার কাছে চলে যেতেন। তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকলে, তাঁর সাহচর্য পেলে সেইসব মানসিক যন্ত্রণা কোথায় হারিয়ে যেত, কোনও কথা বলারও দরকার পড়ত না! এমনই ছিল তাঁর সাহচর্যের প্রভাব! কোনও ট্রাইব্যুনালে যখন কোনও শ্রমিকের হয়ে তিনি লড়তেন, মনে হত যেন তিনি নিজের জন্যই লড়ছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ‘‘আমি নিজেকে নেতা মনে করি না। ওই শ্রমিক, তার পরিবার, তাদের দুঃখকষ্ট— এসবের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে যাই। ওদের কষ্টের সঙ্গে একাত্ম না হলে আমরা ওদের হয়ে লড়ব কী করে! এ তো আর শুধু আইনের লড়াই নয়!’’ এটিও আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা। শ্রমিকরাও সব সময় বুঝতে পারত যে, কমরেড শঙ্কর সাহা তাদের নিজের লোক। কেউ কেউ বলেছে, উনি যখন কারখানা-গেটে কিংবা কোনও বস্তি এলাকায় যেতেন, কারওরই মনে হত না উনি একজন নেতা। তিনি যেন নিতান্তই তাদের আপনজন। এই ছিল কমরেড শঙ্কর সাহার প্রকৃতি। আমার মনে হয়, তিনি পার্টিতে এসেছিলেন মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিয়ে। পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রয়াত নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় তিনি সর্বহারা মূল্যবোধ অর্জন করেছিলেন।

স্মরণসভার সভাপতি কমরেড রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, জনপ্রিয়তা অর্জনের কোনও ঝোঁক তাঁর ছিল না। বহু আন্তর্জাতিক ও সর্বভারতীয় বৈঠকে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি যোগ দিতেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বলীয়ান বিপ্লবী সর্বহারা আন্দোলনের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও শ্রমিক সংগঠনই এই বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে চলছে না। দেশের মধ্যেও আমাদের সংগঠন ছাড়া আর কোথাও এই আদর্শের চর্চা হচ্ছে না। আমাদের দল ও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেড শঙ্কর সাহা এই বিপ্লবী লাইনের ভিত্তিতে আলোচনা করতেন এবং তা উপস্থিত জনদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করত। নানা জায়গা থেকে তিনি প্রশংসা পেতেন, শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করতেন, কিন্তু কোনও দিন সে সবের জন্য এতটুকু অহঙ্কারের প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। কোনও দিন নিজের ঢাক নিজে পেটাননি। কোনও দিন কেউ তাঁকে বলতে শোনেনি— আমি এই করেছি, ওই করেছি— ওরা প্রশংসা করে আমার সম্পর্কে এই বলেছে, ওই বলেছে— কোনও দিনও তাঁর মুখে এসব কথা শোনা যায়নি। আমার কাছে যখন রিপোর্ট করতেন, এ সমস্ত বাদ দিয়ে সাধারণ ভাবে বিবরণ দিতেন।

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন অফিসেও কেউ তাঁকে এসব বলতে শোনেনি। বরং সবসময় তাঁর চিন্তা ছিল, পার্টি নেতৃত্ব তাঁর উপরে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তা ঠিকমতো পালন করতে পারছেন না, পিছিয়ে আছেন। তাঁকে আরও কাজ করতে হবে। এই ছিল তাঁর ভাবনা।

আরেকটি বিষয় আমি এখানে বলতে চাই। সরকার ও মালিকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কারও প্রতি তাঁর শত্রুতা, কারও সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা ছিল না। তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এখানেও আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি— ‘‘সর্বহারা শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন বিপ্লবীর কাছে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামটা হল ব্যক্তিনিরপেক্ষ শ্রেণিসংগ্রাম। নিজে ধনী না হতে পারার ঈর্ষা থেকে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চেতনা জন্ম নেয় না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে তার লড়াইয়ের চরিত্রও ব্যক্তিগত নয়। এগুলো ব্যক্তিনিরপেক্ষ। তার ঘৃণা মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে, ব্যক্তিমালিকের বিরুদ্ধে নয়। এই ঘৃণার চরিত্র যদি ব্যক্তিগত হয় এবং যদি তা শ্রেণি চেতনা থেকে জন্ম না নেয়, তা হলে সুযোগ-সুবিধা পেলে, পরিস্থিতি তৈরি হলে একজন শ্রমিকের বুর্জোয়া বনে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।’’ কর্তৃপক্ষ ও মালিকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে কমরেড শঙ্কর সাহা সর্বদা এই সংস্কৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। সেই কারণেই তিনি তাঁদের সম্মান পেয়েছেন।

একটা ঘটনার কথা বলছি। একটা কারখানায় লাগাতার শ্রমিক বিক্ষোভ চলছিল। কোনও একটা ঝামেলায় একজন ম্যানেজার মারা যান। মালিকরা ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের বিরুদ্ধে কেস করে। এই নেতাদের একজন ছিলেন আমাদের ইউনিয়নের। যদিও ঘটনার সময় উনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন না, ঘটনার সঙ্গে আদৌ জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ‘অ্যাটেম্পট টু মার্ডার’ (খুন করার চেষ্টা)-এর গুরুতর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। শঙ্কর সাহা মালিকের সাথে দেখা করেন। বলেন, ‘‘আমি আপনার কাছে দয়াদাক্ষিণ্য চাইতে আসিনি। আপনি আমায় চেনেন। যদি আপনি জেনে থাকেন যে আমাদের ইউনিয়নের নেতাটি দোষী, তা হলে তাকে শাস্তি দিন। কিন্তু আমি জানি যে, সে ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এই অবস্থায় আপনি কী করবেন?’’ মালিক উত্তর দিলেন, ‘‘শঙ্করবাবু, আমি জানি আপনি আমাদের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে এবং আপনার ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকে সৎ মানুষ হিসাবে সম্মান করি। আমি জানি উনি ওই ঘটনায় জড়িত ছিলেন না। আমি কথা দিচ্ছি, ওঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে না।’’ সত্যিই ওই নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়নি। দেখুন একবার, শুধু শঙ্কর সাহাকে মালিক শ্রদ্ধা করতেন বলে কী ঘটনা ঘটল!

এবার অন্য একটি ঘটনার কথা বলব। আসানসোলের এক কমরেড আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর এক বন্ধু ইস্ট ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে শিলং-এ চাকরি করছেন। দিল্লিতে সরকারি বডি মিটিং সেরে কমরেড শঙ্কর সাহা যে প্লেনে ফিরছিলেন, ওই জেনারেল ম্যানেজারও সেই প্লেনে ছিলেন। পরের দিন ভোরে ওই জেনারেল ম্যানেজার আমাদের আসানসোলের কমরেডটিকে বলেন, ‘‘গতকাল প্লেনে আসার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কথাবার্তা ও আচরণ থেকে তাঁর গভীর জ্ঞান ও রুচি-সংস্কৃতির উঁচু মানের পরিচয় পেলাম। এমন মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি! তাঁর কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।’’ পরে ওই কমরেড জেনেছেন যে, এই মানুষটি ছিলেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা। ঘটনাটা আপনারা লক্ষ করুন— প্লেনে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই একজন সাধারণ মানুষের মনে কমরেড শঙ্কর সাহা কী গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছিলেন। তাও তো প্লেনে কথা বলারই বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায় না। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই আসতেন, তাঁদের ওপরেই তাঁর এমন প্রভাব পড়ত। একেই বলে চরিত্র, সংস্কৃতি। অন্ধকার ঘরে আলো ছাড়া সোনার টুকরো খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আলো ছাড়াই অন্ধকারের মধ্যে হিরের টুকরো দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতি ও চরিত্র হল এমনই। দ্ব্যর্থহীন ভাবেই আমি বলতে পারি যে, তিনি সংস্কৃতির অত্যন্ত উচ্চ মান অর্জন করেছিলেন। বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে একাত্মতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় তিনি অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছেছিলেন। শুধু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সামনে নয়, আমাদের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের কাছে, এমনকি আমার কাছেও কমরেড শঙ্কর সাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। কোনও দ্বিধা না রেখেই এ কথা আমি বলছি। জীবনের অধিকাংশ সময়টা তিনি কাটিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে, তার পরে স্ত্রীর সঙ্গে একটা ছোট্ট ঘরে। যে যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন তাঁর ছিল, তা তিনি পাননি।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি তাঁকে আমাদের শিবপুর সেন্টারে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। প্রথম দিকে তাঁর একটু দ্বিধা ছিল। আরেকটি কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। কমরেড শঙ্কর সাহার জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাধারণ। খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড়, থাকা— সব দিক দিয়েই তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। নিজের জন্য একটা টাকা খরচ করতে হলেও তিনি দু’বার ভাবতেন— বাজে খরচ হচ্ছে না তো! কারণ, এ তো জনগণের টাকা! অনেক কমরেডই জানেন না, যখন তিনি আইএলও সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে করে চাল, আলু, অন্যান্য

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শঙ্কর সাহা স্মরণে

ছয়ের পাতার পর

জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সে সব তিনি রান্না করে খেতেন যাতে ওখানে যাওয়া এবং থাকার জন্য যে টাকা তাঁকে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার কিছুটা তিনি বাঁচাতে পারেন। নিজের খাওয়ার জন্য সে টাকার পুরোটা তিনি খরচ করে ফেলেননি যাতে পার্টির হাতে কিছু টাকা তুলে দেওয়া যায়। পার্টি কিন্তু এটা তাঁকে করতে বলেনি। এ ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত।

যখন অসুস্থ হলেন, হার্ট অপারেশন হল, তখন হাঁটতে কষ্ট হত। একবার ফুটপাতে পড়েও গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম— "তুমি একটা গাড়ি বা ট্যাক্সি নাও"। কিন্তু তিনি রাজি হননি। আমি বলেছিলাম, "তুমি একটু বেশি করে প্রোটিন খাও"। ডিম, কলা— এসব খাওয়া দরকার ছিল তাঁর। কিন্তু শঙ্কর সে সব খাননি। খবর পেয়ে আমি বকলাম। বললাম— "যদি তুমি নিজে ব্যবস্থা না করো, তা হলে পার্টি অফিস থেকে আমি এসব পাঠাব। তুমি কি সেটা চাও?" তারপর সে সব চালু হয়।

শিবপুর সেন্টারে যখন তাঁকে আনা হল, সেন্টারের সদস্যরা হয়ত জানেন না, ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। কারণ, এই প্রথম তাঁর কোনও সেন্টারে থাকার সুযোগ হল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত একজন অ্যাডভোকেট, যিনি আমাদের দলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী— তাঁকে, আমার নাম করে আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে তিনি সেন্টারে থাকছেন। বোধহয় এক বছরের কাছাকাছি এখানে ছিলেন এবং সারা জীবনে শুধু এই সময়টুকুতেই তিনি একটু যত্ন পেয়েছিলেন। এ কথা আমি বলছি।

এই সেন্টারের সকলকে নিয়ে বসে আমি কমরেড শঙ্কর সাহা সম্পর্কে তাদের অনুভূতির কথা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি কতখানি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিচারধারা নিয়ে চলতেন, সকলেই চোখের জলে সে কথা বলেছে। তিনি কখনও এটা খাব, সেটা খাব— এমন বলতেন না। এসব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। যা দেওয়া হত খুশি মনে সেটাই খেতেন। কখনও নিজের জন্য অন্যকে ব্যস্ত করতে চাইতেন না। কমরেডরা নিজেরাই এগিয়ে এসে তার জন্য করত। এখানেই হোক বা অফিসে, যদি কোনও বিষয়ে কারও সাহায্য দরকার হত, প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "তুমি কি ফাঁকা আছ, নাকি কোনও কাজ আছে?" যদি সেই কমরেডটির হাতে সময় থাকত, তা হলে তাকে বলতেন, "আমাকে একটু সাহায্য করো"। প্রত্যেকের সাথে— বয়স্ক, কমবয়সী এমনকি বাচ্চাদের সাথেও তাঁর ছিল বন্ধুসুলভ, কমরেডসুলভ সহজ সম্পর্ক। আগে কখনও সেন্টারে না থাকলেও এক বছরের মধ্যেই নিজেকে তিনি সেন্টারের সুযোগ্য সদস্য প্রমাণ করেছিলেন। অত্যন্ত ইম্পার্সোনাল এই মানুষটি সেন্টারের অন্য সদস্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সেন্টার মিটিংয়ে অনেকে বলেছেন, 'উনি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন'। কমরেডরা তাঁর ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, অদম্য তেজ এবং জীবনের প্রতি ইম্পার্সোনাল দৃষ্টিভঙ্গির কথা লিখেছেন। কোনও কমরেডের সাথে যখনই তিনি কিছু আলোচনা করতেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার কথা তুলে ধরতেন।

উল্লেখ করা দরকার, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী— এঁরাও আমাদের শ্রমিক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড তাপস দত্ত প্রথম দিকে শ্রমিক আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এঁরা মূলত পার্টির নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ফলে কমরেড শঙ্কর সাহার সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা চলে না। কমরেড শঙ্কর সাহা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুরোপুরি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে কমরেড শঙ্কর সাহা ছিলেন অতুলনীয়। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর মধ্যে দিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষের সুগভীর চিন্তাধারা ও উন্নত সংস্কৃতির প্রকৃত ও সর্বোন্নত প্রতিফলন ঘটত। আমাদের সামনে কমরেড শঙ্কর সাহা এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

বর্তমানে আমরা একটা অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমাদের দেশ সহ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক শ্রেণি নানা ভয়ঙ্কর আক্রমণের শিকার। বিশ্বে এখন সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই, নেই শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী জোয়ার। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দেশে কোটি কোটি মানুষের হাতে কাজ নেই। ছাঁটাই হয়েছেন কোটি কোটি শ্রমিক-কর্মচারী। প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। শ্রমিক অধিকার বলে কিছু নেই। শ্রম-আইনগুলিকে এমন ভাবে পাল্টে দেওয়া হয়েছে যে সেগুলিকে শ্রমিকদের স্বার্থে আইন না বলে মালিকদের স্বার্থে আইন বলাই ভাল। স্থায়ী পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের বেশিরভাগই এখন অস্থায়ী বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। তাদের মজুরি বা কাজের সময়, কোনওটাই নির্দিষ্ট নয়। দাসশ্রমিকের মতো করে তারা কাজ করে। নতুন একদল শ্রমিক সৃষ্টি হয়েছে— পরিযায়ী শ্রমিক। আগে পরিযায়ী শ্রমিক বলে কিছু ছিল না। ফলে, এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন শক্তিশালী বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন কমরেড শঙ্কর সাহার মতো আরও অনেক নেতা। শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের এখন এটাই দাবি। বিপ্লবী আন্দোলনের এখন এটাই দাবি। বর্তমান সময় জোরালো ভাবে এই দাবি জানাচ্ছে।

কমরেডদের কাছে আমি বলছি— বর্তমানে আমরা অনেক নেতা ও কর্মীকে হারাচ্ছি। এই শূন্যস্থান আপনাদের পূরণ করতে হবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা গভীর ভাবে চর্চা করুন। নিজেকে বিকশিত করুন। পুঁজিবাদী দোষ, অভ্যাস, অপসংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে আপস করবেন না। নিজের উদ্যোগ বাড়ান। বিপ্লবী জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন। এটাই এখন সময়ের আহ্বান। শ্রমিকদের প্রতি কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি আহ্বান রেখেছেন। আমাদের বহু নেতা-কর্মী প্রয়োজন যাঁরা সেই আহ্বান শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যাবেন। কী সেই আহ্বান? "আপনারা শ্রমিক। আপনারা সভ্যতার স্রষ্টা। এই সভ্যতা মুক্তির জন্য আর্তনাদ করছে। এই সভ্যতা আপনাদের কাছে মুক্তি চাইছে। শুধু আপনার নিজের মুক্তি নয়, আপনার উপর নির্ভর করে রয়েছে গোটা মানবজাতির মুক্তি।"— শ্রমিকদের প্রতি এই ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের আহ্বান। আমাদের আজ দরকার কমরেড শঙ্কর সাহার মতো অনেক নেতা যাঁরা এই আহ্বান শ্রমিকের কাছে, চাষির কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে যাবেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, শোককে কী ভাবে গ্রহণ করতে হয়। আপনাদের সে কথা অবশ্যই বুঝতে হবে। এই পথে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে আপনারা যদি আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারেন, তাহলেই কেবল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝান্ডা বহন করে, উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতির ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে আমরা শোষিত মানুষ তথা গোটা মানবজাতির মুক্তির ব্রত সার্থক করতে পারব। এটাই আমাদের দৃঢ় পণ হওয়া উচিত। এই কথা বলেই আমি আলোচনা শেষ করলাম।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি ভাসা এলাকার দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড পিয়ারালি ঘরামি ১৭ জুলাই রাতে বুকের যন্ত্রণা নিয়ে জয়নগরে এক নার্সিংহোমে ভর্তি হন এবং সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। সত্তরের দশকে কমরেড পিয়ারালি ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ওই আন্দোলনের নেতা কমরেড ইয়াকুব পৈলান ও কমরেড আমির আলি হালদারের সান্নিধ্যে এসে কমরেড পিয়ারালি শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে দলের কাজ শুরু করেন। ক্রমে তিনি ওই এলাকার গরিব মানুষের আপনজন ও দলের একজন সংগঠক হয়ে ওঠেন। জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে গড়ে ওঠা বহু আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সংসারের প্রবল দুঃখ দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও দলের কাজকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। দলের আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা ও নেতৃত্বের প্রতি ছিল আনুগত্য। প্রয়াত কমরেডের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা নেতৃত্ব ও অঞ্চলের বহু সাধারণ মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

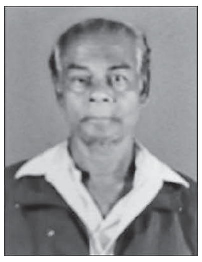

কমরেড পিয়ারালি ঘরামি লাল সেলাম

ডোমের চাকরির লাইনে ইঞ্জিনিয়াররাও

একের পাতার পর

রূপ ধারণ করেছে।' তবে যে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা কর্মসংস্থানের, সাধারণ মানুষের উন্নয়নের এত গল্প শোনাচ্ছেন! ভারত ৩ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি এবং বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির অংশীদার বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। সারা দেশের বেকারত্বের চিত্র দেখে আত্মসন্তুষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীরা দাবি করছেন, রাজ্যে বেকার যুবকের সংখ্যা কমে গেছে! এরপরও কি তারা এই দাবি করবেন?

শিল্প নেই, কলকারখানা বন্ধ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর কাজের সুযোগ থাকলেও সেখানে ঘোর অনিশ্চয়তা— কাজের এবং বেতনের। ফলে সরকারি যে কোনও চাকরির, সামান্যতম বেতনের সুরক্ষার সুযোগ পেলে তাকেই খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরছেন কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো বিপুল বেকার-বাহিনী। ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনে চরম অনটনের শিকার এই সব যুবকরা নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বলি দিয়ে, লাশকাটা ঘরের কাজ পাওয়ার জন্য তাই এইভাবে বিশাল লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। উচ্চশিক্ষিত এই যুবকরা যারা এই কাজ পাবেন তাঁরা যে শিক্ষা দক্ষতা অর্জন করলেন, সামাজিক যে সম্পদ এই শিক্ষাদানে ব্যয়িত হল— এ কি তার চরম অপচয় নয়?

রাজ্য তথা দেশে এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল কেন? আর্থিক উদারিকরণের ৩০ বছর অতিক্রম করল ভারত, বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী মহলে সংস্কার নীতির বাহবা কুড়োচ্ছে শাসক বিজেপি। কংগ্রেসের পথে হাঁটা বিজেপির এই সংস্কার নীতির সুফল নাকি এতটাই ফলেছে যে, ডিজিটাল অ্যান্ড সাস্টেনেবল ট্রেড ফেসিলিটেশন সমীক্ষা অনুযায়ী ভারত বহু উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে ব্যবসায়িক উন্নয়নে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পকেটে পুরে ফেলেছে (আনন্দবাজার পত্রিকা-২৪ জুলাই '২১)। কিন্তু এই ব্যবসায়িক লাভ গেছে কার ঘরে? প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে নেতারা দু'বেলা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে বোঝাচ্ছেন, ভারতের উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখযোগ্য। এই সমীক্ষাই বলছে, উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের মুষ্টিমেয় উপরতলার মানুষের— দেশের এক শতাংশ সুবিধাভোগী শ্রেণি, একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের। নিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে, শোষণ করে, জাতীয় সম্পদ লুঠ করেই তাদের এই আর্থিক রমরমা। সর্বত্র সাধারণ মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দিন চলছে, বেকারির হার তরতর করে বেড়ে চলেছে। খাতায়-কলমে সরকারি হিসেবে মানুষের উন্নয়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। এই কথাটা কোনও বুর্জোয়া পণ্ডিতও আজ অস্বীকার করতে পারছেন না। বুর্জোয়া সংস্কারের পক্ষে তাঁরা যত বড় বড় কথাই বলুন, শ্রেণি বিভাজনের (মালিক-শ্রমিক) এই নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য (ধনী-দরিদ্র) বৃদ্ধির পুঁজিবাদী ফর্মুলাকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারছেন না। এক শ্রেণির সীমাহীন লোভই যে আর এক শ্রেণির ভয়ঙ্কর দুর্দশার জন্য দায়ী, এই ভয়াবহ বৈষম্যের কারণ যে শোষণমূলক, ব্যক্তিমালিকানামূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তা চাপা থাকছে না। ভয়াবহ বেকারির কারণও যে, মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার উপর নির্ভর করে থাকা এই ব্যবস্থা, তার স্বরূপটাই প্রকাশ্যে এসেছে করোনা অতিমারির এই দুঃসময়ে। তাই ক্ষমতাসীন দলগুলির দয়াভিক্ষা নয়, নেতাদের সহানুভূতি কুড়োনোর চেষ্টা করে নয়, মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে গেলে একদিকে কাজের দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, অন্যদিকে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ বেশিরভাগ মানুষকে কর্মহীন অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে তাকে ভাঙার লড়াইয়ে সামিল হতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সেমিনার

অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষায় ‘ব্লেন্ডেড মোড’ আনা হয়েছে। ১৭ জুলাই অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি আয়োজিত এক অনলাইন সেমিনারে এ কথা বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। তিনি আরও বলেন, ইতিহাসের গেরুয়াকরণকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইউজিসিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিষয়ে তাঁদের চালিকা শক্তি হল ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম। আসলে হিন্দু মহাসভা, আর এস এস তাদের হিন্দুত্ববাদী স্বপ্নকে এই শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার জন্য পরিকল্পনা করছে। ভারতের বহুত্ববাদ, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, ‘নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান’ আজ বিপন্ন হতে চলেছে। হিন্দুত্ববাদী চিন্তাকে শিক্ষার মধ্যে এনে আমাদের দেশের নবজাগরণ, সমাজ সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সার্বজনীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎপাটন করতে চাইছে।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সীমা বৈদ্য বলেন, ব্লেন্ডেড মোডের মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক অনলাইন করণ করা হবে। তিনি ইউজিসি প্রকাশিত ব্লেন্ডেড মোডের নথি বিশ্লেষণ করে দেখান, কীভাবে প্রতিটি পয়েন্টে অনলাইন শিক্ষার উপরে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতির দ্বারা রাষ্ট্র শিক্ষায় সামগ্রিক বেসরকারিকরণ ঘটাবে এবং পড়াশোনার সমস্ত দায় ছাত্রদের উপরে চাপিয়ে দেবে। এর ফলে ছাত্ররা পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারাবে, ড্রপ আউট বাড়বে, শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে সামাজিকবোধ, দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে সেটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভিতর থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে।

কলকাতার আই আই এস আর-এর ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী ‘ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম’ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে পুরানো ধ্যানধারণা, অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিক চিন্তাকে শিক্ষায় আনার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি দেখান কীভাবে সভ্যতার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান জগতের ধারণা বিকশিত হয়ে আজকের বিজ্ঞানসম্মত ধারণাগুলি এসেছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে নানা অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে বিজ্ঞান বলে চালানো হচ্ছে। তারা গণেশের ঘাড়ে হাতির মাথাকে দেখিয়ে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির অগ্রগতি, সাত হাজার বছরের আগে বিমানের অস্তিত্ব, গোরু শ্বাসপ্রশ্বাসে অক্সিজেন ছাড়ে ইত্যাদি ধারনা সিলেবাসে আমদানি করছে। অথচ উক্ত সময়ে ভারতে জ্ঞানচর্চায় যারা বিশ্ব খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই বরাহমিহির, আর্যভট্ট, পাণিনি, চরক, শুশ্রুতদের নাম মুখে পর্যন্ত আনছেন না।

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ রায় ইতিহাসের গেরুয়াকরণের উপরে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ইউজিসি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইতিহাসের নতুন একটি সিলেবাস ঘোষণা করেছে, যেখানে ইতিহাস পড়ানো হবে অথচ ইতিহাস কীভাবে নির্মাণ হয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সেই চিন্তাকে সামনে রেখে কীভাবে ইতিহাসের আহরিত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করতে হয় সেই পদ্ধতি ছাত্রদের শেখানো হবে না। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের গৌরবের নামে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়ানোর কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেই সময়ের চরক, কৌটিল্য, কালিদাস প্রমুখ রচনাকে সিলেবাস থেকে বাদ দিয়েছেন। ইতিহাসের নামে বিকৃতি, পক্ষপাত দুষ্ট, কাল্পনিক ভাবনা, অনৈতিহাসিক বিদ্যাগুলিকে ইতিহাসের নামে চালাতে চাইছে। এর ফলে ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক, সামগ্রিক, বাস্তব তথ্যনির্ভর বিষয়গুলি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কমিটির রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। তিনি এই ধ্বংসাত্মক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই শিক্ষানীতির দ্বারা সমাজে দুটি শ্রেণি তৈরি হবে। শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবসায়ীকরণ ও কর্পোরেট করণের জন্য এই ধরনের সিলেবাস আমদানি করা হচ্ছে। জাতি সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকেই ধ্বংস করার এই পরিকল্পনাকে আমাদের রুখতেই হবে।

কমিটি ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসকে সেভ এডুকেশন দিবস হিসাবে পালন করার আহ্বান জানায় এবং কলকাতা সহ জেলায় জেলায় রাস্তায় নেমে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

দিল্লিতে তুমুল কৃষক বিক্ষোভ

কৃষকদের সংসদ অভিযানে যন্তর-মন্তরের সভায় এআইকেকেএমএস-এর মহিলা সদস্যরা। ২৬ জুলাই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি সেভ এডুকেশন কমিটির

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে ২৩ জুলাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়। কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। কোভিড সংক্রমণকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল শিক্ষাকেই শিক্ষার মূল ধারা হিসেবে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করছে।

কিন্তু অনলাইন শিক্ষা যে মূল ধারার শ্রেণি-কক্ষ শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না, এ কথা গত দেড় বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবী সহ অনেকেই বুঝতে পারছেন। আইসিএমআরও স্কুল খোলার সুপারিশ করেছে। তিনি বলেন, যুদ্ধকালীন গুরুত্ব সহকারে ১২ -১৮ বছর বয়সী সমেত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের টিকাকরণ করতে হবে এবং সমস্ত রকম কোভিড প্রোটোকল মেনেই অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ১২-১৮ বছর বয়সী সমস্ত স্কুল ছাত্রদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকাকরণ করে স্কুল চালু করছে। তা হলে ভারত পারবে না কেন? ১২-১৮ বছর বয়সীদের টিকা বাজারে এসেছে এবং ভারত সরকারও সেগুলির ছাড়পত্র দিয়েছে ও বাজার থেকে কেনার অনুমতি দিয়েছে। তা হলে কেন এত বিলম্ব? আসলে ডিজিটাল শিক্ষাকেই তথাকথিত ‘নিউ নর্মাল’ করে তোলার লক্ষ্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে না। কমিটির দাবি, কোভিড প্রোটোকল মেনে অবিলম্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে।

পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনের সময় সমস্ত রকম ভোটকর্মীর যদি সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্ভব হয় বা ভবানীপুর সহ নানা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য সিংহভাগ নাগরিকের যদি টিকাকরণ সম্ভব হয় তা হলে স্কুল-কলেজ খোলার স্বার্থে সকল ছাত্রের জন্য তা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবি অ্যাবেকার

সংসদের বাদল অধিবেশনে জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০২১ যাতে পাশ করানো না হয় সেই দাবিতে ১৯ জুলাই সারা বাংলা দাবি দিবস পালন করল অ্যাবেকা। রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলাতে কোথাও বিলের কপি পুড়িয়ে, সর্বত্র দাবি ব্যাজ পরিয়ে, প্রতিবাদী পথসভা, অটো প্রচার, বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে দাবি দিবস পালন করা হয়। ১৫টি ডিভিশন ম্যানেজারের অফিস সহ সারা রাজ্যে প্রায় ৬০টি এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে। সাধারণ মানুষ বিলের আক্রমণ শুনে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এক বছরের জন্য বিদ্যুৎ বিল মকুব, গৃহস্থে প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট এবং কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া, এলপিএসসি/ ডিপিএসসি এক বছরের জন্য মকুব এবং এলপিএসসি/ ডিপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটের বেশি না করার দাবি জানানো হয়।

এআইইউটিইউসি-র বিক্ষোভ দুর্গাপুরে

বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের দাবিতে, মিড ডে মিল সহ স্কিম ওয়ার্কারদের বিভিন্ন প্রকল্পের ও শিল্পের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এবং পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাস, কেরোসিন সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুরের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলা শ্রমিকরা এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে সোচ্চার হন। এই সব পেশায় নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকরা দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দুর্গাপুর কমিটির পক্ষে রুমু বাউরি অভিযোগ জানান, ভ্যাকসিন না হওয়ার কারণে অনেক পরিচারিকার কাজ চলে যাচ্ছে। মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বুলা বিশ্বাস, কল্পনা মণ্ডল অভিযোগ করেন স্কুল বন্ধ থাকলেও মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসে ৭ দিন স্কুলে যেতে হচ্ছে, অথচ সরকার তাদের ভ্যাকসিনের এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা করেনি। তাঁরা অবিলম্বে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সমস্ত মিড-ডে মিল কর্মীর ভ্যাকসিনের দাবি জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com